দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও তাঁর সংগীত

বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত

কবিতা ও সংগীত, পরস্পরের নিকট-আত্মীয়-এই বিষয়টি সম্পর্কে কাব্য ও সংগীতানুরাগীদের প্রায় সকলেই অবগত। একই মানুষের মধ্যে যুগপৎ কাব্যসৃষ্টি ও সুরসৃজনের গুণ বিধৃত থাকা খুবই বিরল ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী জাতি অতীব সৌভাগ্যের অধিকারী এই কারণে যে, বিভিন্ন সময়ে একাধিক অসামান্য প্রতিভাবান গীতিকার - সুরকারের জ্যোতিচ্ছটায় তাঁরা আলোকিত ও সম্পদশালী হয়েছেন। কবিতার মধ্যে সুর আছে এবং অধিকাংশ কবিতাই অল্পবিস্তর সুরবোধযুক্ত– এই বিষয়টি স্বীকার্য্য হলেও কবি-মাত্রই সুরসৃষ্টির যোগ্যতাসম্পন্ন এমন ধারণা কেউই পোষণ করেন না। সে-ক্ষেত্রে, প্রত্যেক কবি -ই প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন সংগীতকার হিসাবে পরিচিত হওয়ার দাবীদার হয়ে উঠতেন! কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু, বাংলার সংগীতে আধুনিকত্ব নিয়ে আসার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল ইসলাম, দিলীপকুমার রায় প্রমুখ যে গৌরবজনক ভূমিকার সূত্রপাত করেছিলেন, পরবর্তী প্রজন্মগুলির গীতিকার-সুরকারদের অধিকাংশই সেই ভূমিকার ধারাবাহিকতা সচল রাখতে সক্রিয় ও সচেষ্ট হয়েছেন।

বাংলার সমৃদ্ধ কাব্য সমগ্র পরিধির মধ্যে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-অতুল-রজনী-নজরুল –এই পাঁচ কবির দুইজন –অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্ত ছিলেন মূলত সংগীতকার, অতঃপর কবি। সংগীতের সূত্র ধরেই তাঁদের কাব্যসম্পদ আত্মপ্রকাশ করেছে। অপরদিকে, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুল–এঁরা ছিলেন একাধারে কবি ও সংগীতজ্ঞ, গীতিকার ও সুরকার। এঁদের কারুরই শিল্পসৃষ্টির মধ্যে কাব্য থেকে সংগীতকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার উপায় নেই। সংগীত এবং কাব্যকে আশ্রয় করেই এঁদের ব্যক্তিত্ব লীলায়িত, সংগীত ও কাব্যজীবন অভিন্নরূপে প্রকাশিত।

অসামান্য উচ্চস্তরের কবি হওয়া সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন বা সমাদর হয়নি, অত্যন্ত পরিতাপের হলেও বিষয়টি সত্য! অনেকের মতে, তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি, রবীন্দ্রনাথের বিরাট-বিশাল প্রতিভার আড়ালে কিয়দংশে আচ্ছাদিত হয়েছেন। কিন্তু, সম্ভবতঃ মূল তার তা নয়। তৎকাল-প্রচলিত কাব্য সংস্কারের ভূমিকা থাকাও সেক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। ইহমুখী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ও বাস্তবসীমায় আবদ্ধ বস্তুতান্ত্রিক ও সুবোধ্য ছিল তাঁর রচিত কবিতা। ছন্দবৈশিষ্ট্যেও ঘরোয়া ভঙ্গির পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। যে সময়ে কবি বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে রোমান্টিক ভাবপ্রাচুর্য্যের অস্পষ্টতা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নির্বস্তুকতার প্রবাহ চলছে বাংলার কাব্যক্ষেত্রে, দ্বিজেন্দ্রেলাল তাঁর স্ফটিকস্বচ্ছ, স্পর্শগ্রাহ্য কবিতার ডালি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে কিঞ্চিত অসুবিধার সম্মুখীন হলেন, সেই সময়! এ-রকম ধারণার বশবর্তী হওয়াও অসমীচিন হবে না যে অ্যাবস্ট্রাকশন-মুগ্ধ বাংলার তৎকালীন কাব্য রসিকদের রুচি, আত্যন্তিকী স্পষ্টতা আর ইহমুখীনতার প্রাচীন যা ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সেই প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে রবীন্দ্রকাব্যের কুহেলিকাকেই আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরে ছিল। অর্থাৎ, তাঁর কবিতার আপেক্ষিক অবহেলার জন্য কাব্যসৃষ্টির তুলনায় বেশি দায়ী প্রবল বন্যার মুখে ভিন্নতর ভাবমূখী কোনও কবিতা বা কবির টিকে থাকা বাস্তবিকপক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ইদানিংকার অ-সমাদর প্রাপ্তির মূল কারনও অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-সংগীতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার – যার সুত্রপাত রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে - দ্বিজেন্দ্রলালের গানের জনপ্রিয়তাকে বরাবরই ব্যাহত করেছে। অনেকের মতে এমন হওয়ার যুক্তিগ্রাহ্য কোনও কারণ নেই। তাঁদের মতে, দ্বিজেন্দ্রগীতি স্ব-মহিমাতেই রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি টিঁকে থাকবার যোগ্য। কিন্তু, অনস্বীকার্য্য সত্য হল এই যে তা আদৌ কালেভদ্রে, বাংলাগানের কোন আসরে কোন কোন সংগীতশিল্পীর কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রলালের বিস্মৃতপ্রায় গান শোনা যায়। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সংঘর্ষকালীন সময়গুলিতে স্বদেশ-প্রেমে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবার তাগিদে দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক গানগুলিকে একাধিকবার সাময়িক পুনরুজ্জীববন দানের চেষ্টা অবশ্য হয়েছে, কিন্তু তার পরমায়ু যা সুফল বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। অনিবার্যরূপে রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলন, ব্যাপ্তি, জনরিয়তা – সবকিছুই ক্রমবর্দ্ধমান ধারায় প্রবাহিত। অনেকে এমনতর ধারাণা দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন যে, রবীন্দ্রসংগীত চর্চার সঙ্গে সাংস্কৃতিক চর্চার উৎকর্ষ, অভিজাত্য ও কৌলীন্যের অভিমান জড়িয়ে আছে, তাই দ্বিজেন্দ্রলালের গান বা অন্যান্য সংগীতের যথাযথ চর্চা হচ্ছে না! রবীন্দ্রসংগীতের সবিশেষ জনপ্রিয়তার তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের গান!

উল্লেখযোগ্য, দ্বিজেন্দ্রগীতির একটি সুদৃঢ় ভিত্তি আছে। রাগসংগীতের সুস্পষ্ট সংস্কার। এই গানের ভিত্তি বা কাঠামো হল শাস্ত্রীয় সংগীতের ঐতিহ্য। মূলতঃ কাব্যসংগীতগুলির কাঠামো বিশ্লেষণ করলেও উচ্চাঙ্গ-ধ্রুপদ-খেয়ালের সংস্কার বলবৎ আছে– পরিলক্ষিত হয়। ধ্রুপদ বা খেয়াল একটি মাত্র রাগ আশ্রয় করে তার পরিবেশনের অবয়ব গ'ড়ে তোলে। ঠুংরী বা লঘু-শাস্ত্রীয় সংগীতে যে সুরমিশ্রণ ব্যবহৃত হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতের অধিকাংশেই তা অনুপস্থিত। অত্যন্ত একনিষ্ঠতার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সংগীতে এক রাগভিত্তিকতার সংস্কার অনুসরণ করেছিলেন। গানের মধ্যে যদি কখনও বৈচিত্রের, রসের প্রয়োজনে একাধিক রাগের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, তা হয়েছে সমপ্রকৃতির রাগের মধ্যে। অর্থাৎ, দ্বিজেন্দ্রলালের গানের মধ্যে ধ্রুপদ-খেয়ালাঙ্গ গানের সংস্কার জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে।

রবীন্দ্রসংগীতানুরাগীরা অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন যে, রবীন্দ্র-গানে শাস্ত্রীয় প্রভাব কি যথেষ্ট রূপ বলবৎ নয়? নজীর হিসাবে কেন তবে দ্বিজেন্দ্রগীতিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা? তার উত্তরে বলা যায় যে, শাস্ত্রীয় সংগীতের সংস্কার-এর পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীতে দেশজ সংগীতের প্রভাবও প্রবলভাবে উপস্থিত। অস্বীকার করবার উপায় নেই, রবীন্দ্রামোদী গাইয়েরা রবীন্দ্রসংগীতের যে অংশটিকে গ্রহণ করেছেন– তার ভিতর মুখ্য হল দেশজ সংগীতের ঐতিহ্য। অর্থাৎ প্রধানতঃ বাউল-কীর্ত্তন সুরের মিশ্র অংশ বা উত্তর জীবনের সম্পূর্ণরূপে মৌলিক সুরে রচিত গানগুলিকেই পরিবেশ করা হয়; শাস্ত্রীয় সংগীতের আধারে প্রথম জীবনে রচিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসংগীতগুলি মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পী ব্যতিরেকে অধিকাংশ শিল্পীর কাছেই উপেক্ষিত থেকে যায়। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের লোকসংগীতের সুর, মিশ্র সুর ইত্যাদির মধ্যে রাগরাগিনীর বাধ্যবাধকতা নেই।

আমাদের আকর্ষণ বরাবরই সহজাত তার প্রতি –যা সহজ, অনায়াস - অধিগম্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ গান, যেহেতু শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই যথেষ্ট অনুশীলনসাপেক্ষ। রাগরাগিনী সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা সুরবিস্তারের কৌশল জানা না থাকলে দ্বিজেন্দ্রগীতি পরিবেশন সহজসাধ্য নয়। বিশেষতঃ, ধ্রুপদ বা খেয়ালের প্রভাবে প্রভাবান্বিত গানগুলি পরিবেশনের ক্ষেত্রে। জয়জয়ন্তী রাগে রচিত, ধ্রুপদাঙ্গ অতি উৎকৃষ্ট একটি গান– 'প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা' –ধ্রুপদ গাইবার বা পাখোয়াজের সঙ্গে গাইবার অভ্যাস না থাকলে এই গানটির প্রতি সুবিচার এবং তাল-মান রপ্ত হওয়া কঠিন! 'সকল ব্যথায় ব্যথী আমি হই, হই নাকো সুখের ভাগী' – রাগেশ্রী রাগাশ্রিত ধ্রুপদাঙ্গের গানটি গাইতে হলে রাগ-রাগিনী প্রকরণ যথার্থভাবে আয়ত্তাধীন থাকা আবশ্যক। রাগরাগিনীর জ্ঞান ও সুমার্জিত কণ্ঠ প্রয়োজনীয় দ্বিজেন্দ্রগীতির কাব্যসংগীতগুলি পরিবেশনের ক্ষেত্রেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পী অনুশীলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, কঠিন রাস্তায় হেঁটে গান পরিবেশেন করেন, গুণী মহলের স্বীকৃতি পান কিন্তু ব্যাপক শ্রোতৃমহলে কল্‌কে পান না!

রবীন্দ্রনাথের মধ্য ও পরিণত বয়সে রচিত গানগুলির সুর সহজগম্য, দ্বিজেন্দ্রগীতি তেমনি। দ্বিজেন্দ্রগীতির চর্চা ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকবার অন্যতম একটি কারণ অবশ্যই এই বিষয়টি। তৎকালীন নামী উস্তাদদের সান্নিধ্যপ্রভাবাৎ শাস্ত্রীয় সংগীতের রসপান করেছেন– রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল দুজনেই তাঁদের প্রথম জীবনে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের শাস্ত্রীয় সংগীতের ব্যাপক চর্চা ছিল, এ তথ্য সর্বজনবিধিত। একইভাবে, দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কৃষ্ণনগরের বাড়িতেও উস্তাদ-পোষণের রীতি ছিল। প্রথম জীবনে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি যেটুকু আনুগত্য ছিল রবীন্দ্রনাথের, পরবর্তীতে তার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তা কোনদিন ছিন্ন করেননি দ্বিজেন্দ্রলাল। ফলে, শাস্ত্রীয় সুর বরাবরই অনুসৃত হয়েছে তাঁর গানে। ধ্রুপদাঙ্গ, কাব্যসংগীত অথবা দেশাত্মবোধক সমবেত সংগীত–সবধরণের গানে শাস্ত্রীয় প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্ট।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দ্বিজেন্দ্রলালের সমবেত সংগীতগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিদেশী ভঙ্গিতে রচিত হয়েছে মনে হলেও সুরের কাঠামোয় ভারতীয় রাগ-রাগিনীর প্রভাব সুপ্রকট। স্বর-ক্ষেপনের ভঙ্গি পাশ্চাত্য সংগীতের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সুরের ছাঁচ ভারতীয় সংগীত থেকেই আহৃত। বাংলায় বিশেষভাবে প্রচলিত ও সুপরিচিত রাগ-রাগিনী, যেমন– ইমন-কল্যাণ, কেদার, হাম্বীর, দেশ, ঝিঁঝিট ইত্যাদি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশীগানগুলির মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে– কেদার রাগে রচিত– 'ধনধান্য পুষ্পভরা', কল্যাণ ঠাটের আধারে রচিত– 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে', ভূপকল্যাণের আমেজে রচিত –'যেদিন সুনীল জলধি হইতে', ইমনের স্পষ্ট ছায়ার সুরারোপিত– 'সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির' ইত্যাদি গানগুলির। লক্ষণীয়, দ্বিজেন্দ্রলাল সংগীতের সুরের মিশ্রণের পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ, তিনি আবাল্য যে সাংগীতিক ঐতিহ্যে লালিত হয়েছেন তা হল– ধ্রুপদ-খেয়ালের ঐতিহ্য, যে গানে সুরমিশ্রণকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়না। ধ্রুপদ ও খেয়াল–দুই-ই মুলতঃ এক রাগ ভিত্তিক, একটিমাত্র রাগকে ভিত্তি করেই তাদের অবয়ব গঠিত হয়। ঠুংরী গানে যে আদর্শ প্রচলিত, সেই আদর্শের দিকে ঘেঁষেননি তিনি। উল্লেখ্য যে, অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর গানে ঠুংরীর সুরমিশ্রণের আদর্শকেই মূল উপজীব্য করেছিলেন। লোকসংগীতের ঐতিহ্যকেও দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রহণ করেননি। তাঁর সুররচনার বাউল-ভাটিয়ালী ইত্যাদির সংস্কারের প্রতি কোনও পক্ষপাত গোচরে আসেনি। সংগীত-রসিক মাত্রেই জানেন– উল্লিখিত ক্ষেত্রটিতে রবীন্দ্রনাথের অবদান অসামান্য। যে মিশ্রসুরের লীলায় রবীন্দ্রসংগীত সাধারণ শ্রোতার শ্রবণমনকে তৃপ্তি দেয়, তার সিংহভাগই দেশজ বাউলের সমৃদ্ধ ভান্ডার থেকে সংগৃহীত! অথচ, সংগীতের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পূর্ণই কৌলিন্যবাদী বা বিশুদ্ধবাদী, উচ্চাঙ্গ সংগীতের সংস্কার মেনে চলেছেন।

বাংলার প্রচলিত কাব্যসংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সুরের মিশ্রণ? দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু অতি আবেগসমৃদ্ধ কাব্যসংগীতেও সুরমিশ্রণের দ্বারস্থ হননি। অত্যন্ত পরিসিদ্ধ কাব্যসংগীত পর্যায়ভুক্ত একটি দ্বিজেন্দ্রগীতি– 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো' একান্তভাবেই দেশ ঠাঁই আশ্রিত। অন্যদিকে ভুপালী রাগের আধারে রচিত– 'ঘনতমসাবৃত অম্বর ধরনী' সম্পূর্ণভাবে অন্য কোনও রাগ-রাগিনীর ছায়াবিহীন। ইমনকল্যান, ভূপালী, দশে, কেদার, জয়জয়ন্তী, মল্লার, খাম্বাজ ইত্যাদি রাগরাগিনী বাংলার শ্রোতাদের সবিশেষ প্রিয় এবং সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালেও উল্লিখিত রাগ-রাগিনীগুলির প্রতি পক্ষপাত সমধিকরূপে পরিলক্ষিত। ভাস্কর্য বা স্থাপত্যরীতির প্রভেদ দেখা যায় অঞ্চল ভেদে, সংগীতশৈলীর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। রাগ-রাগিনীর একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সংগীতশৈলীর তারতম্যের ক্ষেত্রে। বিশেষ অঞ্চলের জলবায়ু অনুযায়ী বিভিন্ন রাগ - রাগিনীর মেলবন্ধন নির্ভর করে। উপরিল্লিখিত রাগ -রাগিনীগুলি বাংলার প্রকৃতির পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল, যদিও তার কারণ দুর্জ্ঞেয়। বাংলার সংগীতস্রষ্টাদের প্রায় সকলেই উল্লিখিত তত্বটি সম্পর্কে অবগত। তাই এর ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল প্রমুখের সুররচনায় সবথেকে বেশি প্রকট! সম্ভবতঃ বাংলার জলবায়ুর বিশেষ সুত্রেই এই সৌসাদৃশ্যের উদ্ভব ঘটেছে।

পরবর্তী সময়ের সম্ভবতঃ যুগের চাহিদা অনুযায়ী মারু-বেহাগ, শঙ্করাভরণ, সিংহেন্দ্রমধ্যম, শিবরঞ্জনী, আভোগী কানাড়া ইত্যাদি অজস্র রাগ-রাগিনীর চলন হয়েছে শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পীদের মধ্যে। কিন্তু বাংলার সাংগীতিক মেজাজের সঙ্গে এই ধরণের রাগ-রাগিনীর সাযুজ্য সেরকম গভীর নয়! ইমনকল্যাণ বা বাগেশ্রীর পরিবেশনে যে রসের সৃষ্টি হয়, তার সিকিভাগও শিবরঞ্জনী বা সিংহেন্দ্রমধ্যম-র পরিবেশনে হয় কি? শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা সত্বেও কয়েকটি মাত্র বাছাই করা রাগ - রাগিনীর প্রতি সবিশেষ পোশকতা করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল এবং করেছিলেন বাংলার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতেই।

সংগীতের বিশুদ্ধবাদী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, তার অর্থ এই নয় যে নিজস্ব সৃজনী প্রতিভার তাগিদানুযায়ী রং-রস যোজনায় বিমুখ ছিলেন। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ-খেয়াল ভেঙে বাংলাগান রচনা করলেও সেগুলি কপিবুক মার্কা নকল ছিলনা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চস্তরের শক্তিসম্পন্ন কবি। তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল কবিতার মধ্যে নতুন নতুন বৈচিত্র সৃষ্টিতে এবং তার জন্য সবসময় তিনি ছিলেন সচেষ্ট ও সক্রিয়। ছন্দ ও আঙ্গিকে অভিনত্ব-প্রয়াস ছিল অন্তহীন, যা পরবর্তী সময়ে বৈপ্লবিক প্রতিভাত হয়েছে অনেকের চোখেই! বাংলায় সম্মেলক সংগীত ও হাস্যরসাত্মক

গানেরও অন্যতম প্রবর্তক তিনি। কাব্য অথবা সুর– নিছক যান্ত্রিক সৃষ্টিতে কখনও তৃপ্ত থাকতে পারেননি তাঁর মতো নব-সৃজনের গভীর আবেগযুক্ত কবি! হিন্দুস্থানী খেয়ালভাঙা বাংলা অথবা রাগাশ্রয়ী কাব্যগীতি, সবকিছুর মধ্যেই সৃষ্টি প্রতিভার স্বাক্ষর অতিমাত্রায় সুস্পষ্ট। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের ঐশ্বর্য্যে মেলোডির প্রাধান্য অত্যধিক।

সংগীতে সুরের গুরুত্ব সম্পর্কে সবিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। ভারতীয় সংগীতের মেলোডির সংস্কারের উপর অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যাননি। গানকে বাণীপ্রধান করে সুরকে তার অনুগামী করবার বিষয়টিও পছন্দ করেননি। তাঁর সৃষ্ট বিদেশী সুর প্রভাবিত সম্মেলক গানগুলির মধ্যে সুরের আদর্শ বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে, স্বীকৃত ভারতীয় রাগ-রাগিনীর ব্যবহার প্রকাশিত হয়েছে। 'ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র' বা 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয় গাথা' ইত্যাদি সম্মেলক গানে গাইবার ঢং-টাই শুধুমাত্র বিদেশী, বাণী অতি উদাও, সুরভঙ্গি অত্যন্ত বলিষ্ঠ। আক্ষরিক অর্থ এবং সুরের দিক– উভয় ক্ষেত্রেই।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসাত্মক সংগীতের প্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত। অবশ্য, সেই গানগুলিতে বাণী অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও সুরের ভূমিকা অনেকাংশেই গৌণ। সমসাময়িক বাংলার সমাজ, রীতিনীতির সুতীব্র তির্যক সমালোচনায় ভরপুর উল্লিখিত হাসির গানগুলি পর্যালোচনা তাদের স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যঙ্গকাব্যের ক্ষেত্রে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, সুর এ ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নয়। নিতান্তই সরল, সাদামাঠা, কোনও কোনও জায়গায় একদমই আটপৌরে মামুলী সুর ব্যবহৃত হয়েছে এইসব গানগুলিতে। সুর শুধুমাত্র বাণীর অবলম্বন। তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী-ই সৃষ্ট সেই গানগুলির কাব্যাংশ আমাদের মুগ্ধ করে, সুর সম্পর্কে ভাবনার অবকাশ রাখেনা।